কেমন বাংলাদেশ চাই?

আ তি উ র র হ মা ন

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল সকল অর্থেই দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। ছিল খেটে-খাওয়া মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার যুদ্ধ। নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশায় সাধারণ মানুষের সন্তানরা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের স্বপ্ন ছিল আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মতো সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ার। দীর্ঘদিনের আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশায় প্রধানত অবহেলিত, অপমানিত সাধারণ মানুষের সন্তানরা একাত্তরে মরণপণ এক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নপূরণ হবে বলে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাহস, সংগ্রাম, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আপোসহীন নেতৃত্বের মাধ্যমে জনমনে এই প্রত্যাশার শেকড় গেড়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গরিব মানুষও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে তারাও মানুষের মতো বাঁচতে পারবেন, নির্ভয়ে কথা বলার অধিকার পাবেন এবং নিজেদের পছন্দমতো জীবন পরিচালনা করতে পারবেন। জনগণের এই আকাঙ্ক্ষা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে ঘোষিত ও জারিকৃত এবং ১৯৭২ সালের ২৩ মে তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্থান পেয়েছিল। 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার'কে নিশ্চিত করার যে ঘোষণা বাংলাদেশের স্থপতিগণ দিয়েছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতি অংশে এসব অধিকার আরো বিস্তৃতভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' [ধারা ৭ (১)] বলেই বাংলাদেশের সংবিধান তার দায়িত্ব শেষ করেনি। রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহে নাগরিকদের মৌল মানবাধিকার কী করে রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে তা আরো স্পষ্টতর করে দিয়েছে। প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গঠন; জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ; গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত করে প্রশাসনের সর্বস্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ; উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালি সমূহের মালিকানা জনগণকে প্রদান; কৃষক, শ্রমিক তথা অনগ্রসর জনগণকে শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়া; অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা; কর্মের অধিকার, যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার; নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করা; একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাপ্রদান; জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নত করা; সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা; মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করা; অনুপার্জিত আয় ভোগের সুযোগ বন্ধ করা; এ সকল মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল অসঙ্গতিপূর্ণ আইন বাতিল করা এবং আইনের চোখে সকল নাগরিককে সমান দেখার অঙ্গীকার করেছিল ১৯৭২-এর সংবিধান। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলেও সংবিধান প্রদত্ত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির অঙ্গীকারসমূহ পূরণের কথা স্থান পেয়েছিল। কিন্তু দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ তৈরির যে স্বপ্ন আমরা স্বাধীনতার ঊষালগ্নে দেখেছিলাম তা আজো পূরণ হয়নি। নিঃসন্দেহে রাজধানী ঢাকার চাকচিক্য বেড়েছে। রাজকীয় বাড়িঘর, শপিংমল তৈরি হয়েছে। তবে ঢাকার জলুস দিয়ে নিশ্চয় বাংলাদেশের উন্নতি মাপা যাবে না। আজো অসংখ্য গ্রামে সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। আজো বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা হয়। দুর্দশাগ্রস্ত নিরুপায় মানুষেরা বাঁচার তাগিদে দলে দলে ঢাকায় চলে আসে। বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করে। ফুটপাতে ঘুমায়। তাদের জীবনের সামান্যতম নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেই। উলটো স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিগণকে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। পঁচাত্তরের কলঙ্কিত দিনগুলোতে বাঙালি জাতির হৃদয় ভাঙার যে আক্রমণ শুরু হয় আজো তা থামেনি। ওই ভাঙা হৃদয় থেকে প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। দুর্নীতি, কুশাসন, সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের ভয়াল থাবার নিচে বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি অসহায়ের মতো কাতরাচ্ছে। বাংলাদেশের সমাজ থেকে

পরমতসহিষ্ণুতা, কথা বলা ও সমাবেশ করার মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারসমূহ উবে যেতে বসেছে। জীবনের নিরাপত্তা এবং সব ধরনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রসমূহ দ্রুতই সংকুচিত হয়ে আসছে। বিনা বিচারে মানুষ মেরে সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনার যে নির্মম প্রক্রিয়া চালু হয়েছে তা সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী। যে মানবিক মর্যাদা ও পছন্দের জন্য আমরা একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম সেইসব আদর্শ আজ ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। সমাজ ও রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান এই অস্থিতিশীলতা ও অসহায়ত্ব আমাদের বেশির ভাগ মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এমনিতেই আমরা যে সাম্যের অর্থনীতির জন্য মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলাম তা থেকে আমাদের দেশ বহুদূরে। মুষ্টিমেয় মানুষের ঘরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সিংহভাগ ফসল ওঠার কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ আজ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কোনোমতে বেঁচে আছেন। আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের যে চেহারা তা কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আজকের বাংলাদেশে এত প্রাচুর্য অথচ এমন তীব্র বঞ্চনা দেখে মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা সকলের অর্থনৈতিক মুক্তির অঙ্গীকারের কথা বেমালুম আমাদের দেশচালকরা ভুলে বসে আছেন।

বর্তমানে কতিপয়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে অনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতিকৌশল চালু রয়েছে তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। একথা ঠিক দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি খানিকটা ঘটেছে, দারিদ্র্যের হারও বছরে এক শতাংশের মতো করে কমছে (তা সত্ত্বেও ছয় কোটি বা মোট জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশেরও বেশি মানুষ এখনো দারিদ্র্য রেখার নিচে বাস করেন) স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টির বিচারে মানব-দারিদ্র্য কিছুটা কমলেও হত-দরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্টের মাত্রা বেড়েই চলেছে। দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া হয়তো সার্বিকভাবে সরে গেছে, তবে দেশের উত্তরাঞ্চলের কোনো-কোনো পকেটে, বিশেষ করে চরাঞ্চলে মঙ্গা ও দুর্ভিক্ষাবস্থা এখনো বিরাজ করছে। বন্যার মতো দুর্যোগের সময় এই বঞ্চিতজনেরা খুবই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে পড়েন। নিঃসন্দেহে বেসরকারি সংগঠনগুলোর কল্যাণে ক্ষুদ্রঋণ ও নারীর ক্ষমতায়ন খানিকটা বেড়েছে। মানুষের পরিবেশসচেতনতাও আগের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু শাসনব্যবস্থার অদক্ষতা, ক্ষমতাবানদের অনৈতিকতা, অস্বচ্ছতা ও দুর্বৃত্তায়নের কারণে আমাদের মানব-উন্নয়নের আংশিক সাফল্যও আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধে সামাজিক উন্নয়নে যে গতি এসেছিল শেষ পর্যন্ত তা আর ধরে রাখা যায়নি। বিনা প্রশ্নে বিদেশীদের কথামতো দেশের উন্নয়ন নীতিকৌশল সাজাতে গিয়ে দেশ চালকরা আমাদের খেটে-খাওয়া মানুষদের বহুকষ্টের সাফল্য আর রক্ষা করতে পারছেন না। বেকারত্ব, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দুঃশাসনের ভারে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার নতুন নতুন মাত্রা দানা বাঁধছে। যদিও দরিদ্ররা আগের চেয়ে সংগঠিত, সোচ্চার তবুও মূলত ন্যায্য শাসনব্যবস্থার অভাবে তাদের কণ্ঠস্বর আমাদের নীতি-কৌশলে কার্যকরভাবে স্থান পাচ্ছে না। সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তজনরা দিনদিনই আরো নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। এখনো আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, নদীভাঙা মানুষের প্রতি আমাদের নীতিনির্ধারকরা সুবিচার করার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেননি। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের যাঁতাকলের নিচে ফেলে রেখে কতিপয় মানুষের জন্য সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির যে ভ্রান্ত উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে তা অনৈতিক, অদক্ষ এবং রাজনৈতিকভাবে মোটেই টেকসই নয়। এমনকি বিদেশী ঋণদাতারাও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য তাগিদ দিচ্ছে। তাদের এই তাগিদের আলোকে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের প্রণয়নের কিছু উদ্যোগও লক্ষ করা গেছে। কিন্তু বাস্তবে এই কৌশলপত্র কতটা জাতীয় এজেন্ডা হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। সংসদের কোনো অধিবেশনে এই কৌশলপত্র নিয়ে আলাপ হয়নি, বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়নি, নাগরিক সমাজের সকল অংশের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি। খণ্ডিত এই কৌশলপত্রকে কোনো অর্থেই জাতীয় একটি কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। একইসঙ্গে সত্যি সত্যি দারিদ্র্য নিরসনের জন্য যে ধরনের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন, বিশেষ করে গণস্বার্থে জাতীয় ও স্থানীয় বাজেটের অগ্রাধিকার নির্ণয়, সম্পদ সমাবেশ ও বণ্টন এবং বাস্তবায়নের গতিধারা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের সদিচ্ছা সেভাবে নীতিনির্ধারক মহলে ধরা পড়েছে বলে মনে হয় না। অথচ সময়ের দাবি হচ্ছে আমাদের দক্ষ দরিদ্রজনদের প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কারের মাধ্যমে উন্নয়নের হাতিয়ারে পরিণত করা। তাদের উন্নয়নের সক্রিয় অংশীদার

করে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য নামের ভূতটিকে আমরা জাতির মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাই। আমরা স্বপ্ন দেখছি, সমুন্নত এক বাংলাদেশই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিক এবং বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের অস্তিত্বের পূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করতে পারব। দারিদ্র্য নিরসনকে তাই আমাদের উন্নয়ন কৌশলের প্রাণভ্রমরা করা চাই। আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির কাঠামোগত বাধার কারণে দরিদ্র মানুষেরা যেভাবে দিনে দিনে আরো প্রান্তজনে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন সেই প্রক্রিয়াকে অবশ্যই আমাদের ঠেকাতে হবে। উৎপাদনশীল সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার, মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় ও বিশ্ববাজারে অংশগ্রহণে তাদের জন্য যে বাধার দেওয়াল ওঠানো হয়েছে তা ভেঙে ফেলার সকল কৌশল আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এরই মধ্যে দরিদ্র মানুষের একাংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীলতা, দক্ষতা এবং সম্ভাবনার চিহ্ন রেখে চলেছেন। কী করে এসব কাজে তাদের আরো উৎসাহ দেওয়ার মতো নীতি সংস্কার করা যায় সেটিই হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সমাজ ও অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত বিকার বিরাজ করছে তাকে সংশোধন করে সৃজনশীল এই বঞ্চিত মানুষগুলোকে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির এবং ভোগের প্রক্রিয়ায় আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ আমাদেরই করে দিতে হবে। সেজন্য ম্যাক্রো ও মাইক্রো উভয় পর্যায়েই বেশ কিছু প্রশাসনিক ও নীতিকাঠামোর পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনে নয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিকাশমান নয়া প্রতিষ্ঠানকে বাড়তি মদদ দিতে হবে। আর তা করতে পারলেই বাংলাদেশের সম্ভাবনার সিংহ দুয়ার খুলে যাবে।

এই মৌলিক লক্ষ্য সামনে রেখেই আমরা সামগ্রিকভাবে এবং খাতওয়ারি নীতি সংস্কার ও বাস্তবায়নযোগ্য কিছু আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির কথা ভাবতে পারি। প্রবৃদ্ধি নয়, সাধারণ মানুষের বিশেষ করে প্রান্তজনের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ন্যূনতম এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে সরকারি-বেসরকারি অলাভজনক খাতের সকল অংশগ্রহণকারীর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার এবং ইস্পাত কঠিন ঐক্য। দুর্ভাগা এই বাংলাদেশের পোড়খাওয়া মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের লক্ষ্যে ন্যূনতম এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকভাবে অঙ্গীকার করতে হবে সমাজ ও অর্থনীতির নেতাকর্মীদের।

সমাজ ও রাজনীতি আজ স্পষ্টতই দু ভাগে বিভক্ত। একদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা মানবিকতা, অন্যদিকে সন্ত্রাসনির্ভর প্রতিক্রিয়াশীলতা তথা অমানবিকতা। একদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায্য শাসনের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য ও কুশাসনের পক্ষে অবস্থান নেওয়া। একদিকে দরিদ্র মানুষের জন্য অংশগ্রহণমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ, অন্যদিকে কতিপয়ের জন্য উন্নয়ন। প্রথম দলে যারা স্পষ্টতই তারা প্রগতির পক্ষে। অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক তারা। আর দ্বিতীয় দলে যারা তারা সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক। প্রথম দল মানবাধিকারে বিশ্বাসী, দ্বিতীয় দল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম ধারার সঙ্গে যুক্ত সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকে আজ তাই জোট বাঁধতে হবে মানবতা ও সমাজের ন্যায় বোধ রক্ষা করার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের মৌল চাওয়া-পাওয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়ে আজ তাদের এক হতে হবে। এই ঐক্যকে টেকসই করার জন্যই দেশবাসীর কাছে একটি সুদূরপ্রসারী ’ভিশন’ উপস্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। আগামীদিনের বাংলাদেশ কেমন হবে, কী ধরনের সমাজ ও অর্থনীতি আমরা গড়তে চাই তার সুস্পষ্ট ধারণা দেশবাসীকে দিতে হবে জাতীয় নেতৃত্বকেই। ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য একটি বাঁচার কর্মসূচি জনগণের সামনে উপস্থাপন করা নেতৃত্বের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে।

মোটা দাগে বলা যায়, যেকোনো মূল্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমরা গড়তে চাই। অসাম্প্রদায়িক অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র চর্চাকারী সেই বাংলাদেশে নারী-পুরুষ, সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ নাগরিক হিসেবে একই মর্যাদার অধিকারী হবেন। রাজনীতিতেও ধর্মীয় বা সামাজিক কারণে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারীদের কোনো জায়গা হবে না। এমন ধারার সমাজ ও রাজনীতি সচল রাখতে হলে প্রয়োজন হবে ন্যায্য শাসনব্যবস্থা এবং গতিশীল অর্থনীতির। সেই লক্ষ্য পূরণে উল্লেখযোগ্যভাবে জাতি গঠনের জন্য নিবেদিত নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্কার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে নিতে হবে। প্রতিটি খাতে জনস্বার্থে সংস্কারের রূপরেখা জনগণকে আগেভাগেই জানাতে হবে।

সমাজ ও অর্থনীতির বর্তমান টালমাটাল অবস্থাতে আগামীদিনের বাংলাদেশকে কেমনভাবে আমরা গড়ে তুলতে চাই সে কথাটি আমাদের নেতৃবৃন্দকে প্রাঞ্জল ভাষায় বলতে হবে। মনে রাখা চাই, দুঃখী মানুষ শুধু শুধু কুঁড়েঘর থেকে বের হয়ে খোলা আকাশের নিচে গিয়ে জড়ো হবেন না। তাদের যতক্ষণ পর্যন্ত কুঁড়েঘরের চেয়ে ভালো টিনের অথবা আধাপাকা ঘরের আশ্বাস না দেওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বর্তমানের সম্বল ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে হাঁটবেন না। সে কারণেই তাদের জন্য চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক বাংলাদেশের স্বপ্ন। সে স্বপ্নকে জাগাতে না পারলে বাংলাদেশের অধঃপতন থামানো যাবে বলে মনে হয় না।